

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা জান্নাত শুভ্রা

রোলঃ 227021523

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা জান্নাত শুভ্রা

রোলঃ 227021523

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের বিধান ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহানা জান্নাত শুভ্রা, আইডিঃ 227021523 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন

কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের বিধান ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফারহানা জান্নাত শুভ্রা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফারহানা জান্নাত শুভ্রা

আইডিঃ 227021523

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	1
অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান।	1
নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান.....	3
যেসব শর্তে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা যাবে.....	3
অমুসলিম দেশে যেভাবে বসবাস করবে	4
জীবিকার তাগিদে অমুসলিম দেশে যাওয়া যাবে?.....	5
অমুসলিম দেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার বিধান	7
ইসলাম কি অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বের অনুমোদন দেয়?.....	11
অমুসলিম দেশে মুসলিম পরিচয় রক্ষার উপায়.....	12
অমুসলিমদের সালাম দেওয়ার নিয়ম.....	16
অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে কি?.....	16
অমুসলিমদের জন্যে উদারতা ও সম্মানবাহার ইসলামের শিক্ষা	24
অমুসলিমদের সঙ্গে যেমন ছিল নবীজির আচরণ	28
অমুসলিমদের সঙ্গে যেমন ছিল নবীজি	30
অমুসলিমদের দেয়া ইফতার খেলে রোজা হবে কি?.....	34
অমুসলিম দেশে মুসলিম স্থাপনা.....	36
অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার	36
গ্রন্থসহায়িকা	41

ভূমিকা

আজকাল নানা কারণে প্রতিনিয়ত দুনিয়ার মুসলিম দেশগুলোর বহু মুসলমান নাগরিক বিভিন্ন অমুসলিম দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন এবং সেখানে থিতু হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু চিন্তার কথা হলো, অমুসলিম দেশের অনৈসলামিক পরিবেশে কীভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেন তাঁরা? ইসলাম একে কীভাবে দেখে? নিজেদের ইমান রক্ষা ও দীন পালনে তাঁদের কী ধরনের জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়? এসব জটিলতা কাটিয়ে ওঠার উপায় কী? ইসলামি জীবনদর্শনের আলোকে এ নিয়ে গবেষণা করা সময়ের দাবি। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের এই সংকলন।

অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান।

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাস ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করার বিধান নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের অবস্থা এবং ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাদের মনোভাব ও অবস্থান বিবেচনায়। অমুসলিম দেশগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. যেখানে ধর্মবিদ্বেষ প্রবল

যেসব দেশে সাধারণভাবেই ধর্মবিদ্বেষ প্রবল। বিশেষত যেসব দেশের মানুষ ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সন্ত্রাস বলে এবং যেসব দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামবিদ্বেষ উসকে দেয়, সেসব দেশের স্থানীয় মুসলিমরা সেখানে ধৈর্যসহ বসবাস করবে এবং দিনের ব্যাপারে যেন শীথিলতা চলে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

তাদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের অবকাশ হলো, ‘কিন্তু কেউ অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা নাহল, আয়াত : ১১৫)

তবে কোনো মুসলিম দেশ থেকে এমন দেশে হিজরত (দেশান্তর) করা বৈধ নয়। কেননা যেখানে ইসলাম দ্বিন পালনের সুযোগ না থাকলে মাতৃভূমি ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে এমন পরিবেশে যাওয়া কিছুতেই বৈধ হবে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘যারা নিজেদের ওপর অবিচার করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতারা বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, পৃথিবীতে আমরা অসহায় ছিলাম।

২. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে

যেসব দেশে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও চিন্তার স্বাধীনতা আছে এবং যেখানে বিশেষ একটি ধর্মের অনুসারীরা অন্যদের প্রভাবিত ও পদানত করতে সচেষ্ট নয়; বিশেষত যেখানে ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রের অবস্থান নিরপেক্ষ এমন দেশে বৈধ উদ্দেশ্যে যাওয়া এবং অবস্থান করা বৈধ। যেমন চাকরি, লেখাপড়া ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ জানেন যে তোমাদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।

’ (সূরা মুজ্জামিল, আয়াত : ২০)

নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান

কোনো মুসলমানের জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বৈধ কি না—এ বিষয়ে সমকালীন আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তাদের মধ্যে আল্লামা মোস্তফা আল-ঝারকা, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ ও মান্না আল-কাত্তান প্রমুখ আলেম মুসলমানের জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণকে হারাম বলেছেন। মিসরের বিখ্যাত আলেম ও ধর্মতাত্ত্বিক হাসান আল-বান্না বিষয়টিকে ‘আকবারুল কাবায়ির’ (জঘন্যতম কবিরা গুনাহ) বলেছেন। তাদের দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী—‘মুমিনরা যেন মুমিনরা ছাড়া অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৮)

যেসব শর্তে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা যাবে

(ড. ইউসুফ আল-কারজাভি)সহ বহু আলেম মনে করেন, অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের বিষয়টি শর্তসাপেক্ষ। যদি অমুসলিম দেশের পরিবেশ ঈমান ও ইসলামের জন্য বৈরী না হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান রক্ষার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায়, তবে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের অবকাশ আছে। কেননা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না এমন অমুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো, ‘দ্বিনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’ (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)

এ ছাড়া অমুসলিম দেশের মুসলমানের নাগরিকত্ব গ্রহণের ইতিবাচক প্রভাবও আছে। কেননা তা অমুসলিম দেশে ‘উজুদু ইসলামী’ তথা ইসলামের অস্তিত্বকে দৃঢ় করে এবং ইসলাম প্রচারের সুযোগ বৃদ্ধি করে। মুসলমানের অবস্থানের ফলে সেসব দেশে মাদরাসা-মসজিদের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যা স্থানীয়দের ইসলাম সম্পর্কে জানতে উদ্বুদ্ধ করে এবং ইসলাম গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। বিপরীতে ইসলাম ও মুসলমানের অনস্তিত্ব ইসলাম প্রসারের পথরুদ্ধ করে। যা বৈশ্বিক ধর্ম ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অমুসলিম দেশে যেভাবে বসবাস করবে

মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ার পরও জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) সপ্তম হিজরিতে খায়বার বিজয়ের আগ পর্যন্ত একজন অমুসলিম কর্তৃক শাসিত অমুসলিম দেশ হাবশায় অবস্থান করেন। এতে প্রমাণিত হয়, দিন প্রচারের স্বার্থে মুসলিম দেশে বসবাস করা বৈধ। পবিত্র কোরআনেও দিন প্রচারের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, ‘হে রাসূল, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা পৌঁছে না দেন, তবে আপনি তাঁর বাণী প্রচার করলেন না।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭)

প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, অমুসলিম দেশে মুসলমানের অবস্থান দিনের জন্য কল্যাণকর তখনই হবে, যখন সে তার যাপিত জীবনে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে এবং তার পরিবারকে দিনের বিধান অনুসারে পরিচালনা করবে। যেন তার সমগ্র জীবনেই দিন প্রস্ফুটিত হয়।

নবীজি (সা.)-এর সতর্কবার্তা

অমুসলিম দেশে বসবাসের ব্যাপারে নবীজি (সা.) সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, ‘আমি সেসব মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৬৪৫)

তিনি আরো বলেছেন, ‘কেউ কোনো মুশরিকদের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করলে সে তাদেরই মতো।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৭৮৭)

উল্লিখিত হাদিসের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসরা বলেন, মুসলিমরা অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ ও সেখানে বসবাসের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবে। বিশেষত যখন তার ঈমান ও ইসলাম হুমকির মধ্যে পড়ার ভয় থাকে।

জীবিকার তাগিদে অমুসলিম দেশে যাওয়া যাবে?

হালাল উপার্জন এবং হালাল উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ রাসুল আলামিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তারই ইবাদত করার জন্য।

ইবাদত করা যেমন ফরজ, ঠিক তেমনি হালাল উপার্জন বা হালাল রুজি অন্বেষণ করাও ফরজ। আল্লাহ পাকের নির্দেশ- সালাত সমাপ্ত হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহে জীবিকা অন্বেষণ কর, তথা উপার্জন কর (সূরা জুমুয়া-১০)।

জীবিকা উপার্জনের জন্য মানুষ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। কেউ চাকরি করেন, কেউবা ব্যবসা বাণিজ্য করেন। আবার অনেকে দেশের বাইরে উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে কাজ করতে যান। এক্ষেত্রে সবাই মুসলিম দেশে যাওয়ার সুযোগ পান না। অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও যেতে হয় অনেককে।

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাস, চাকরি, লেখাপড়া ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করার বিধান নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের অবস্থা এবং ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাদের মনোভাব ও অবস্থান বিবেচনায়।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ ড. ইউসুফ আল কারযাভি রহ. বলেছেন, অমুসলিম দেশগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. যেখানে ধর্মবিদ্বেষ প্রবল : যেসব দেশে সাধারণভাবেই ধর্মবিদ্বেষ প্রবল। বিশেষত যেসব দেশের মানুষ ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সন্ত্রাস বলে এবং যেসব দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামবিদ্বেষ উসকে দেয়, সেসব দেশের স্থানীয় মুসলিমরা সেখানে ধৈর্যসহ বসবাস করবে এবং দিনের ব্যাপারে যেন শীথিলতা চলে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

তাদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের অবকাশ হলো, ‘কিন্তু কেউ অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা নাহল, আয়াত : ১১৫)

তবে কোনো মুসলিম দেশ থেকে এমন দেশে হিজরত (দেশান্তর) করা বৈধ নয়। কেননা যেখানে ইসলাম দ্বিন পালনের সুযোগ না থাকলে মাতৃভূমি ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে এমন পরিবেশে যাওয়া কিছুতেই বৈধ হবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘যারা নিজেদের ওপর অবিচার করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতারা বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, পৃথিবীতে আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? তাদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস।’ (সূরা নিসা, আয়াত : ৯৭)

২. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে : যেসব দেশে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও চিন্তার স্বাধীনতা আছে এবং যেখানে বিশেষ একটি ধর্মের অনুসারীরা অন্যদের প্রভাবিত ও পদানত করতে সচেষ্ট নয়; বিশেষত যেখানে ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রের অবস্থান নিরপেক্ষ এমন দেশে বৈধ উদ্দেশ্যে যাওয়া এবং অবস্থান করা বৈধ। যেমন চাকরি, লেখাপড়া ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ জানেন যে তোমাদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।’ (সূরা মুজ্জামিল, আয়াত : ২০)

তবে এমন দেশে অবস্থানের ক্ষেত্রেও শর্ত হলো নিজের, পরিবারের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বিনদারির ব্যাপারে আশঙ্কা না থাকা এবং বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাবে ঈমান ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসে দুর্বলতা তৈরি না হওয়া। যদি সেখানে যাওয়ার পর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তবে তা পরিত্যাগ করতে হবে। জীবন সেখানে যতই প্রাচুর্যময় হোক না কেন।

কেননা আল্লাহ বলেন, ‘বোলো, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।’ (সূরা তাওবা, আয়াত : ২৪)

অমুসলিম দেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার বিধান

কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করা, সে দেশের ন্যাশনালিটি বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করা এবং সে দেশের নাগরিকদের সমান আবাসন সুযোগ এবং সমান নাগরিক সুবিধা গ্রহণ করে স্বতন্ত্রভাবে নিজের আবাসস্থল গড়ে তোলা, এমন একটি বিষয় যার হুকুম স্থান-কাল-পাত্রভেদে এবং বসবাসকারীদের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাধারার ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন

১. যদি কোন মুসলমানের ওপর স্বদেশে কোন অন্যায় অভিযোগ ও অপরাধ ছাড়াই অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়, বেআইনিভাবে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয় অথবা তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়; এমতাবস্থায় কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া এসব জুলুম অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার যদি কোন পথ খোলা না থাকে, তাহলে এই অবস্থায় ওই ব্যক্তির জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং সেই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তথায় অবস্থান করা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। তবে শর্ত হল এই যে, তাকে এ ব্যাপারে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে সেখানে গিয়ে তার জীবন চলার পথে ধর্মীয় অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলবে। সেখানকার প্রচলিত যাবতীয় মন্দকাজ ও কুসংস্কার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

এর দলিল হল, সাহাবাগণ মক্কায় কুরাইশদের কাছে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তখন হাবশায় কাফেরদের রাজত্ব চলছিল। তখন সাহাবায়ে কেরাম সেখানে অবস্থান করেছেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পরও কোন কোন সাহাবী সেখানে অবস্থান করেছিলেন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.) খায়বার যুদ্ধের সময় ফিরে এসেছিলেন। তখন ছিল হিজরী সপ্তম বছর। আর মানুষের আত্মিক অধিকার হল যে, সে তার নফস বা আত্মাকে যে কোন ধরনের অন্যায় ও জুলুম থেকে নিরাপদে রাখবে। সুতরাং যদি সে কোন কাফের রাষ্ট্র ছাড়া নিজের জন্য কোন নিরাপদ স্থান না পায় তাহলে তার জন্য সেখানে হিজরত করাতে কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হবে এবং হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।

২. এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিকভাবে চরম সঙ্কটে নিপতিত হয়; এবং বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও যদি নিজের মুসলিম রাষ্ট্রে জীবিকানির্বাহের কোন সুযোগ সৃষ্টি না হয়, এমনকি

এখানে সে এক মুঠো খাবারেরও মুখাপেক্ষী হতে হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে তার বৈধ কোন চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যায়, আর এই সুযোগে যদি সে সেই অমুসলিম দেশে বসবাস শুরু করে দেয়, তাহলে [এক নম্বর উত্তরে বর্ণিত দুইটি শর্তের সাথে] তার জন্য সেখানে বসবাস করা জায়েয হবে। কেননা অন্যান্য ফরয সমূহের মধ্যে হালাল উপার্জন ও একটি অন্যতম ফরয। যার জন্য শরীয়ত কোন স্থান বা কোন জায়গাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়নি; বরং এর জন্য রয়েছে ব্যাপকতর সাধারণ অনুমতি। পবিত্র কুরআনের আয়াতে হালাল জীবিকা উপার্জনের জন্য যে কোন স্থানে গমনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور

‘তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর এবং তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।’ (সূরা মূলক : আয়াত ১৫)

৩. এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এই নিয়তে বসবাস করে যে, সে দেশে অবস্থানরত অমুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবে, তাদেরকে মুসলমান বানাবে অথবা সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদের দ্বীন ও শরীয়তের সহীহ তালিম দেবে। দ্বীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এবং শরীয়তের আহকাম ও বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করবে। এ জাতীয় নিয়তে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা শুধু জায়েযই নয় বরং এটি একটি বিরাট সওয়াব ও পুণ্যময় কাজ। অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়ীন এই মহৎ উদ্দেশ্য ও সৎ নিয়ত নিয়ে বিভিন্ন অমুসলিম দেশে বসবাস করেছেন। পরবর্তীকালে এগুলো তাদের জীবনে উত্তম ও সৎকর্ম এবং তাদের বর্ণাঢ্য জীবনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৪. যদি স্বদেশে কোন ব্যক্তির এই পরিমাণ জীবিকার বন্দোবস্ত থাকে, যার মাধ্যমে সেই শহরের অবস্থানরত অন্যান্য মানুষের জীবন চলার মান অনুযায়ী সেও চলতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারপরও শুধু জীবন চলার মান আরো উন্নত করার উদ্দেশ্যে, সম্পদ বৃদ্ধি এবং আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে থাকে, তাহলে এ জাতীয় হিজরত মাকরুহর আওতাভুক্ত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা কোনরূপ ধর্মীয় বা পার্শ্বিক প্রয়োজন ছাড়া সেই রাষ্ট্রে বসবাস তাদের প্রচলিত অপসংস্কৃতির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়ারই নামান্তর হবে। বিনা প্রয়োজনে নিজের দ্বীন-ধর্ম এবং আখলাক-চরিত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া কোনক্রমেই ঠিক হবে না। কেননা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কেবল আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস এবং সুখ-স্বর্গের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম

রাষ্ট্রে বসবাস করে থাকে, তার মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি দুর্বল হয়ে যায় এবং খুব দ্রুতই এ ধরনের মানুষ বিধর্মীদের আচার-আচরণের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়।

এ কারণেই হাদীস শরীফে তীব্র প্রয়োজন ছাড়া মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এ সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফে হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযি.) থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله

'যে ব্যক্তি মুশরিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করে, সে তাদেরই মত।' (আবু দাউদ)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إ

نا بربي من كل مسلم يقيم بين المشركين، قالوا يا رسول الله لم؟ قال لا ترى أي ناراهما.

'আমি ওইসব মুসলমানদের থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কী? জবাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ইসলামের অগ্নি আর কুফুরের অগ্নি একই সঙ্গে থাকতে পারে না। তোমরা এটি পৃথক করতে পারবে না যে, এটি কি মুসলমানদের অগ্নি না মুশরিকদের অগ্নি।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের অনেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। যেমন কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে এর অর্থ হল এই যে, হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলমান আর মুশরিক সমকক্ষ হতে পারে না। উভয়ের আহকাম ভিন্ন ভিন্ন। আবার কোন কোন আলেম বলেছেন, এই হাদীসটির সারমর্ম হল এই যে, আল্লাহ তাআলা দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফরকে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য কাফেরদের রাষ্ট্রে তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা জায়েয নেই। কেননা যখন মুশরিকরা

তাদের (বিজয়ের) মশাল সমুজ্জল করবে, আর তাদের সঙ্গে মুসলমানরা নীরবতা অবলম্বন করে থাকবে, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটিই মনে হবে যে, তারা (মুসলমানরা) এদেরই অন্তর্ভুক্ত। ওলামায়ে কেরামের এই ব্যাখ্যা দ্বারা একথাও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যদি কোন মুসলমান ব্যবসা

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেও কাফেরদের রাষ্ট্রে গমন করে, তাহলে তার জন্য সেখানে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা মাকরুহ।' (মাআলিমুস সুনান লিল-খাতাবী : [আবু সুলায়মান আল খাতাবী, মৃত্যু : ৩৮৮ হি.] খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৩৭)

হযরত মাকহুল (রাযি.) থেকে সুনানে আবু দাউদের মারাসিলে বর্ণিত হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لا تتركوا الذرية ازاء العدو.

নিজের সন্তানদের মুশরিকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেবে না।

এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেবলমাত্র চাকরি করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং তাদের জনসংখ্যা বর্ধিত করার কারণ হওয়া এমন একটি (ধিকৃত) কাজ, যার দ্বারা তার বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়।

৫. কোন ব্যক্তি যদি লোক সমাজে সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কিংবা অন্য মুসলমানের ওপর নিজের বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে কিংবা দারুল কুফরের নাগরিত্ব এবং জাতীয়তাকে দারুল ইসলামের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মনে করে তাদের ন্যাশনালিটি গ্রহণ করে থাকে অথবা তার পার্থিব জীবনের থাকা-খাওয়া ও চাল-চলনে তাদের নীতি গ্রহণ করে বাহ্যিক জীবনে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করার জন্য এবং তাদের মত হয়ে যাওয়ার জন্য বসবাস করে থাকে তাহলে এ জাতীয় যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হিসেবে গণ্য হবে। এই বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট যে, এর জন্য কোন দলিল পেশ করা প্রয়োজন নেই।

প্রতিবেশী অমুসলিম হলে ইসলামের নির্দেশনা

যদি কারও কোনো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হলো- তার সঙ্গেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের হক রক্ষা করে চলতে হবে। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে এ দু'টি সম্পর্ক রক্ষা করার ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে।

অমুসলিম প্রতিবেশী অসুস্থ হলে কী করব

প্রতিবেশী অমুসলিম হলেও তার সঙ্গে সদাচরণ করা, বিপদাপদে সাহায্য-সহযোগিতা করা, অসুস্থ হলে খোঁজখবর নেওয়া ও সাহায্য করা ইসলামের শিক্ষা। এটিও প্রতিবেশীর হকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘দ্বিনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’ (সূরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)

আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, ‘এক ইহুদি বালক রাসুল (সা.)-এর খেদমত করত। একবার সে অসুস্থ হলে রাসুল (সা.) তাকে দেখতে গেলেন।

অতঃপর তাকে বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। ফলে সে মুসলিম হয়ে গেল। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৬৫৭)

সুতরাং প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে হিন্দু ছেলেটিকে দেখতে যাওয়া ও আর্থিক সহযোগিতা করা অন্যায় হয়নি; বরং প্রতিবেশীর হক আদায়ের কারণে তা প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে গণ্য হবে। তবে মুসলমানের ওপর অমুসলিমকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়া নিষেধ। কোরআনে এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

সূত্র : ফাতহুল বারি : ৩/২৬২; ১০/১২৫; উমদাতুল কারি : ২১/২১৮; আলবাহরুর রাযিক : ৮/২০৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ৫/৩৪৮; রদ্দুল মুহতার : ৬/৩৮৮

ইসলাম কি অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বের অনুমোদন দেয়?

ইসলাম মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বের অনুমোদন দেয়না। ইসলামে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব বা আন্তরিক সম্পর্ক রাখা হারাম। কুরআন-সুন্নাহয় খুব স্পষ্টভাবেই, অমুসলিমদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। একজন অমুসলিম যতই ভালো

মানুষ হয়ে থাকুক না কেনো, আপনাকে যতই ভালোবাসুক না কেনো, আপনার যতই উপকার করুক না কেনো, আপনি যদি একজন মুসলিম হয়ে থাকেন আপনি তাকে বন্ধু মনে করতে পারবেন না, তার প্রতি আপনার মনে কোনো ভালোবাসা থাকতে পারবে না, তাকে আপনার শত্রু হিসেবেই দেখতে হবে। কথিত শান্তির ধর্ম থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায়

সূরা আত-তাওবা: আয়াত ১১৩-১১৪

কেবল অমুসলিমদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা যাবে না তাই নয়, নিজের আপন মা বাবা ভাই বোন অমুসলিম হলে তাদের জন্যও জাহান্নামের অনন্তকাল শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করা যাবে না।

অমুসলিম দেশে মুসলিম পরিচয় রক্ষার উপায়

চাকরি, লেখাপড়া, যুদ্ধ-বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষা ও উন্নত জীবন লাভের আশায় মুসলিম দেশ থেকে বহু মুসলিম অমুসলিম দেশে পাড়ি জমায়। তাদের অনেকেই দীর্ঘ মেয়াদে অমুসলিম দেশে বসবাস করে।

আবার কেউ কেউ অমুসলিম দেশের নাগরিকত্বও গ্রহণ করে। অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের সামনে বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলো মুসলিম পরিচয় রক্ষা করা।

বিশেষত অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিম পরিবারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানদের অনেকেই ইসলাম ও ইসলামী জীবনধারা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, মুসলিম পরিচয় ত্যাগ করছে। যা খুবই উদ্বেগজনক।

মুসলিম পরিচয় বহনের গুরুত্ব

একজন মুসলমানের জন্য মুসলিম পরিচয় বহন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে তা অপরিহার্য।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২)

আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরবিদরা বলেন, তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির জীবনই মুসলমানের জীবন। আর তা হলো জীবনের সর্বত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য। (মআরেফুল কোরআন : ২/১১০)

পূর্ণ পরিচয় বহন করা আবশ্যিক

মুসলমানের জন্য আবশ্যিক হলো পরিপূর্ণরূপে ইসলামকে ধারণ করা। আংশিক পরিচয় ধারণ এবং আংশিক ত্যাগ করা গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনরা! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ২০৮)

আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ‘তোমরা একই ধর্মাচার মেনে চলো, পরিপূর্ণ ইসলাম মান্য কোরো এবং তার ওপর দৃঢ় থাকো।’ (তাফসিরে কুরতুবি : ৩/৩৯২)

পরিবার রক্ষায় চাই বিশেষ পরিকল্পনা

অমুসলিম দেশের ইসলামবিমুখ সমাজে পরিবারের সদস্যদের দিন ও ইসলাম রক্ষায় বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যিক। যেমন পরিবারে দিনচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, শিশুদের প্রয়োজনীয় দ্বিনি শিক্ষা নিশ্চিত করা, পরস্পরকে দিন পালনে উৎসাহিত করা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো, ‘হে মুমিনরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কোরো আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতারা, যারা অমান্য করে না তা যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই তারা করে।

(সুরা তাহরিম, আয়াত : ৬)

আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা আবশ্যিক

ইসলাম মা-বাবা ও অভিভাবককে সন্তান-সন্ততি ও অধীনদের দিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার গুরু দায়িত্ব দিয়েছে। কেউ যদি এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে তবে পরকালে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘প্রত্যেক নবজাতক ফিতরতের (ইসলামের) ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তাঁকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিউপাসকে পরিণত করে।

(সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৮৫)

মুসলিম পরিচয় রক্ষার উপায়

কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম রক্ষার কয়েকটি উপায় বর্ণনা করা হলো। যার মূলকথা হলো, ইসলাম ও মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা অন্তরে ধারণ করা এবং হীনমন্যতার শিকার না হওয়া। যেমন—

১. ইসলামই আলো : সমগ্র পৃথিবী ও মানবজাতির জন্য ইসলামই আলো। ইসলাম ছাড়া আলোকিত জীবনযাপন সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর (কোরআন) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত : ১৬)

২. ইসলামই পূর্ণাঙ্গ : পৃথিবীতে যত দিন ও ধর্ম আছে তার মধ্যে আল্লাহ ইসলামকেই পূর্ণতা দান করেছেন। তাই ইসলামকেই ধারণ করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে, ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দিন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দিন মনোনীত করলাম।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত : ৩)

৩. মুসলমানই শ্রেষ্ঠ জাতি : মুমিন অন্তরে এই বিশ্বাস লালন করে যে, মুসলমানই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তাই মুসলিম পরিচয় ধারণ করা লজ্জার নয়। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহতে বিশ্বাস করো।’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)

৪. আল্লাহর আনুগত্য সর্বত্র : মুমিন আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ইসলামের পরিচয় ধারণ করে। আল্লাহর আনুগত্য দেশে ও প্রবাসে সর্বত্র আবশ্যিক। মহানবী (সা.) বলেন, ‘তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ করো, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।’ (জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৯৮৭)

৫. দৃঢ়তাই সাফল্য : প্রতিকূল পরিবেশে ঈমান ও ইসলামকে আঁকড়ে ধরা এবং তার ওপর দৃঢ় থাকাই সাফল্য। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই এই কোরআন পথদেখায় সেই পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।’ (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৯)

৬. সুপথে চলার সুফল নিজের : সুপথে চলতে কষ্ট হলেও এর সুফল ব্যক্তি নিজেই ভোগ করবে। ইরশাদ হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই

কল্যাণের জন্য। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বোলো, আমি তো কেবল সতর্ককারীদের জন্য একজন। ’ (সুরা নামল, আয়াত : ৯২)

৭. পরকালই প্রকৃত ঠিকানা : মুমিনের প্রকৃত ঠিকানা পরকাল। তাই সে পার্থিব স্বার্থের জন্য পরকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। আল্লাহ বলেন, ‘কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখেরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী। ’ (সুরা আলা, আয়াত : ১৬-১৭)

পরিচয় ত্যাগের ক্ষতি

কোরআন ও হাদিসের একাধিক স্থানে মুসলিম পরিচয় ত্যাগ করার ব্যাপারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। ’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪০৩১)

অন্য হাদিসে নবীজি (সা.) বলেন, ‘দাড়ি-চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করো, আর ইহুদিদের অনুকরণ করো না। ’ (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫০৭৩)

মনে রাখতে হবে, কোনো অমুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলাম ও ইসলামের পরিচয় ত্যাগের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। কেননা তারা মুসলিমদের ঈমানহারা না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না। পবিত্র এই বাস্তবতায় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ কতই না চমৎকার বলেছেন, ‘ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তোমর প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করো। বোলো, আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ। ’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১২০)

অমুসলিমদের সালাম দেওয়ার নিয়ম

অমুসলিমকে ‘সালাম’ দেওয়া বৈধ নয়। কোনো প্রয়োজনে দিতে হলে ‘আসসালামু আলা মানিত্বাবাআল হুদা’ বলবে। আর অমুসলিমরা সালাম দিলে তদুত্তরে শুধু ‘ওয়া আলাইকুম’ বলবে।

অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে কি?

মানবতার ধর্ম ইসলাম। ইসলামের দর্শন হলো- প্রত্যেক মানুষে মানুষে রয়েছে মানবিক সম্পর্ক। শরিয়ত এ সম্পর্ক অস্বীকার করে না। তাই মুসলমানের জন্য অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া জায়েজ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তমও বটে। তাদের দাওয়াত গ্রহণ করাও জায়েজ, তবে শর্ত হলো তাদের প্রদান করা খাবারের মাঝে কোনো হারাম বা সন্দেহযুক্ত বস্তু থাকতে পারবে না।

আল্লাহর রাসূল (সা.) অসংখ্যবার অমুসলিমদের নিজের বাড়িতে মেহমান বানিয়েছেন এবং নিজেও একজন ইহুদির দাওয়াত কবুল করেছেন। তাই ইসলামিক স্কলাররা অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহণ করা জায়েজ ও বৈধ বলেছেন।

তথ্যসূত্র : বুখারি শরিফ, হাদিস নং-২৬১৭, মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-৫৩৬৪, ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫২৩, কিতাবুল ফাতাওয়া, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২০২।

কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার কিছু বাহ্যিক রূপ

আল্লাহ তা‘আলার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে কাফেরদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক রূপে গ্রহণ করার বাহ্যিক রূপসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে

(১) পোষাক-পরিচ্ছদ ও কথা-বার্তায় কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। কেননা পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা ও অন্যান্য বিষয়ে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা তাদেরকে ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুসরণ করবে, সে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে”।[1]

সুতরাং কাফেরদের খাস স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, তাদের অভ্যাস, ইবাদত, পথ-পদ্ধতি ও আখলাক-চরিত্রের সাদৃশ্য গ্রহণ হারাম। যেমন দাড়ি কামিয়ে ফেলা, মোচ লম্বা করা, বিনা প্রয়োজনে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা, বিনা প্রয়োজনে বিদেশী ভাষায় কথা বলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার এবং অন্যান্য বিষয়ে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম।

(২) কাফেরদের দেশে বসবাস করা এবং তা থেকে মুসলিমদের দেশে দীন নিয়ে হিজরত না করা। কেননা অমুসলিমদের দেশে দীন নিয়ে বসবাস করা সম্ভব না হলে মুসলিমদের উপর হিজরত করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় কাফেরদের দেশে বসবাস করা তাদেরকে ভালোবাসা ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করার প্রমাণ।

(৩) এ জন্যই হিজরত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের উপর আল্লাহ তা‘আলা কাফেরদের মাঝে বসবাস করা হারাম করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾

“যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না? এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান। তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল”। (সূরা আন-নিসা: ৯৭-৯৯)

যেসব দুর্বল লোকেরা হিজরত করার সামর্থ্য রাখে না, তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কাফেরদের দেশে বসবাস করার অনুমতি দেননি। তবে অমুসলিমদের দেশে যাদের বসবাস করার মধ্যে দীনের কল্যাণ রয়েছে যেমন আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া, কাফেরদের দেশে ইসলাম প্রচার করা তাদের জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস করার অনুমতি রয়েছে।

(৪) আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন ও ভোগ-বিলাসের জন্য কাফেরদের দেশে ভ্রমণ করাও তাদেরকে বন্ধু বানানোর লক্ষণ। বিনা প্রয়োজনে কাফেরদের দেশে ভ্রমণ করা হারাম। তবে চিকিৎসা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কাফেরদের দেশে ভ্রমণ করা বৈধ। এমনি অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা ব্যতীত মানুষের কল্যাণার্থে যেসব বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়, এসব বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনার্থেও অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধ। এসব প্রয়োজনে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা জায়েয। প্রয়োজন শেষ হলেই মুসলিম দেশে ফিরে আসা আবশ্যিক। এসব উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা জায়েয হওয়ার শর্ত হলো মুসলিম সেসব দেশে গিয়ে স্থায়ী দীনের নিদর্শনাবলী প্রকাশ করবে এবং ইসলামকে নিয়ে গর্বিত থাকবে। সেই সঙ্গে শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য ক্ষতিকর স্থানগুলো থেকে দূরে থাকবে। এমনি আল্লাহর দীনের দাওয়াত প্রচারের জন্য কাফেরদের দেশে সফর করা বৈধ অথবা ওয়াজিব।

(৫) মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের প্রশংসা করা ও তাদের পক্ষপাতিত্ব করাও তাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করা ও বন্ধু বানানোর আলামত। এটি ইসলাম ভঙ্গের ও মুরতাদ হওয়ার অন্যতম কারণ। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(৬) বিনা প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাহায্য নেয়া, তাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করা, মুসলিমদের গোপন বিষয়গুলোতে ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তাদেরকে নিয়োগ করা, তাদেরকে ঘনিষ্ঠ ও উপদেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করাও তাদেরকে অভিভাবক বানানোর লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَفُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمَسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِيرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرِبْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আপনজন ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোনো ক্রটি করবে না। যা তোমাদের ক্ষতি করে তাই তাই তারা কামনা করে। তাদের মনের হিংসা ও বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকে প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং যা কিছু তারা নিজেদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তা এর চেয়েও মারাত্মক। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি। যদি তোমরা অনুধাবন করো। তোমরা তাদেরকে ভালোবাসো; কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসেনা অথচ তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তারা তোমাদের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরাও বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতো বেশী বেড়ে যায় যে, তারা নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকে। তাদেরকে বলো, নিজেদের ক্রোধ ও আক্রোশে তোমরা নিজেরাই জ্বলে পুড়ে মরো। আল্লাহ মনের গোপন কথাও জানেন। তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের উপর কোনো বিপদ এলে তারা খুশি হয়। তোমরা যদি সবার করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন”। (সূরা আলে-ইমরান: ১১৮-১২০)

উপরোক্ত আয়াতগুলো কাফেরদের অন্তরের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে, মুসলিমদের প্রতি তারা যে হিংসা-বিদ্বেষ গোপন রাখে, তাদের বিরুদ্ধে তারা যে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করে, মুসলিমদের যে ক্ষতি তারা পছন্দ করে এবং যে কোনো উপায়ে তারা মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয়ার যে পরিকল্পনা তারা করে, উপরোক্ত আয়াতগুলো তাও প্রকাশ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, মুসলিমগণ অমুসলিমদের প্রতি যে আস্থা এবং বিশ্বাস রাখে তারা তাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ আবু মূসা আশআরী রাহিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি উমার রাহিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, আমার একজন খ্রিষ্টান সেক্রেটারী রয়েছে। তিনি বললেন, তোমার কী হলো? আল্লাহ তোমার অকল্যাণ করুন! তুমি কি আল্লাহর এ কথা শোন নি? আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ

করে তাহলে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। অবশ্যই আল্লাহ যালেমদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না”। (সূরা মায়েদা: ৫১)

তুমি কেন একজন মুসলিমকে লেখক নিযুক্ত করেনি। আবু মূসা আশআরী রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! সে আমার লেখক হিসাবে কাজ করবে এবং তার দীন সে পালন করবে। তিনি তখন বললেন, আল্লাহ যেখানে তাদেরকে অপদস্ত করেছেন, আমি সেখানে তাদেরকে সম্মানিত করবো না। আল্লাহ যেহেতু তাদেরকে দুর্বল করেছেন, তাই আমি তাদেরকে শক্তিশালী করবো না। আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, তাই আমি তাদেরকে কাছে টানতে যাবো না।

ইমাম আহমাদ ও মুসলিম আরো বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বদরের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন মুশরিকদের জনৈক লোক তার পিছনে বের হলো। হাররার নিকট সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলো। সে বললো, আমি আপনার সাথে যুদ্ধে শরীক হতে চাই। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান রাখো? সে বললো, না। তিনি বললেন, ফেরত যাও। আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য নিবো না।[2]

উপরোক্ত দলীলগুলোর মাধ্যমে আমাদের নিকট মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্মে কাফেরদেরকে নিয়োগ করা হারাম হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল। বিশেষ করে ঐসব গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্বে তাদেরকে নিয়োগ করা হারাম, যার মাধ্যমে তারা মুসলিমদের অবস্থা ও তথ্যসমূহ অবগত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ও তাদেরকে কষ্ট দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে মুসলিমদের দেশে বিশেষ করে হারামাইন শরীফাইনের দেশে কাফেরদেরকে নিয়ে আসা, তাদেরকে শ্রমিক, গাড়িচালক, সেবক ও বাড়িঘরের পরিচর্যাকারী হিসেব নিযুক্ত করা এবং তাদেরকে পরিবারের সাথে মিশ্রিত করে রাখা অথবা মুসলিমদের সাথে তাদেরকে বসবাস করতে দেয়া অমুসলিমদেরকে অভিভাবক ও বন্ধু বানানোর লক্ষণ।

(৭) কাফেররা দিন-তারীখ গণনা করার জন্য যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে তা ব্যবহার করা তাদেরকে অভিভাবক ও বন্ধু বানানোর অন্যতম লক্ষণ। বিশেষ করে যেসব ক্যালেন্ডারের মধ্যে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ঈদ-উৎসব সনাক্ত করা আছে, তা ব্যবহার করাও তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত। যেমন ইংরেজী ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা। মূলত এটি ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম তারিখকে স্মরণ করে রাখার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। এটি খ্রিষ্টানরা

নিজেদের পক্ষ হতে তৈরী করেছে। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম দিবস পালন করা এবং তাকে স্মরণ করে রাখার জন্য ক্যালেন্ডার বানানো তার দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এ ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা তাদের ধর্মীয় নিদর্শন ও উৎসবকে পুনর্জীবিত করায় অংশগ্রহণ করার শামিল।

উমার রাঈয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সাহাবীগণ যখন মুসলিমদের জন্য তারিখ নির্ধারণ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তারা কাফেরদের সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তাদের তারিখ পরিহার করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের বছর থেকে হিজরী সাল ও তারিখ গণনা শুরু করলেন। এতে প্রমাণ মিলে যে, সাল ও তারিখ গণনার ক্ষেত্রেও কাফেরদের বিরোধিতা করা আবশ্যিক। এ ছাড়াও কাফেরদের অন্যান্য খাস অভ্যাসগুলোর বিরোধিতা করা জরুরী।

(৮) কাফের-মুশরিকদের ঈদ-উৎসবে শরীক হওয়া অথবা তা উদযাপনে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানানো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়াও তাদেরকে বন্ধু বানানোর লক্ষণ। আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾

“এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না কিংবা মিথ্যা কথা বলে না” (সূরা ফুরকান ২৫:৭২)। এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন যে, আল্লাহর বান্দাদের গুণাবলী হলো, তারা কাফেরদের ঈদ-উৎসবে উপস্থিত হয় না।

(৯) কাফেরদেরকে অভিভাবক ও বন্ধু বানানোর আরেকটি লক্ষণ হলো তাদের প্রশংসা করা এবং তাদের তামাদুন, সভ্যতার সুনাম করা এবং তাদের বাতিল আকীদা ও ভ্রান্ত দীনের দিকে দৃষ্টি না দিয়েই শুধু তাদের স্বভাব-চরিত্র, অভিজ্ঞতা ইত্যাদিকে পছন্দ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَمْدَنَ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾

“আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনো তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী”। (সূরা ত্বাহা: ১৩১)

উপরোক্ত কথার অর্থ এ নয় যে, মুসলিমগণ কাফেরদের থেকে বিভিন্ন পেশা শিক্ষা করা, বৈধভাবে অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করা এবং যুদ্ধনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্তিশালী হওয়ার উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করবে না; এ সব বিষয়ে তাদের থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়ার মধ্য থেকে। তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে” (সূরা তুল আনফাল: ৬০)

এ উপকারী জিনিসসমূহ এবং সৃষ্টিজগতের গোপন সম্পদগুলো আসলে মুসলিমদের জন্যই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

“বলো, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বলো, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত জিনিস ঈমানদারদের জন্যই”। (সূরা আরাফ: ৩২) আল্লাহ তা‘আলা সূরা জাসিয়ার ১৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

“এবং তিনি আসমান ও যমীনের সমস্ত জিনিসকেই তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। সবকিছুই তার পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে”। (সূরা জাসিয়া: ১৩) তিনি আরো বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

“তিনি তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন”। (সূরা বাকারা: ২৯)

সুতরাং এসব উপকারী সম্পদগুলো কাজে লাগানোর জন্য মুসলিমদের অগ্রসর হওয়া উচিত। এগুলো অর্জন করার জন্য কাফেরদের দ্বারস্থ হওয়া ঠিক নয়। মুসলিমদেরও শিল্প-কারখানা, কারিগরি ও প্রযুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া আবশ্যিক।

(১০) কাফেরদের নামে মুসলিমদের নামকরণ করাও তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার নামান্তর। পিতা-মাতা, দাদা-দাদি ও মুসলিম সমাজের সুপ্রসিদ্ধ নামগুলো বাদ দিয়ে ছেলে-মেয়েদের জন্য বিদেশী নাম চয়ন করা কাফের-মুশরিকদেরকে বন্ধু বানানোর অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রাহমান। ইসলামী নাম পরিবর্তন করার কারণেই বর্তমানে এমন প্রজন্ম দেখা যাচ্ছে, যারা অদ্ভুত ও অপরিচিত নাম রাখে। মুসলিমদের নাম পরিবর্তন করা এমন একটি বিষয়, যা তাদের নতুন প্রজন্মকে পূর্ববর্তী লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কারণ হতে পারে এবং যেসব পরিবার বিশেষ নামের মাধ্যমে পরিচিত ছিল, তারাও অপরিচিত হয়ে যেতে পারে।

(১১) কাফেরদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং তাদের জন্য রহমত কামনা করাও তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা এহেন কর্মকে হারাম করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

“নবী ও ঈমানদারদের জন্য উচিত নয় যে তারা কোন মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয়। যখন পরিস্কার হয়ে গেল যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী”। (সূরা তাওবা: ১১৩) কেননা কাফের-মুশরেকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তাদেরকে ভালোবাসা এবং তাদের দীনকে সঠিক বলার লক্ষণ।

[1]. হাসান সহীহ: আবু দাউদ ৪০৩১, অধ্যায়: কিতাবুল লিবাস।

অমুসলিমদের জন্যে উদারতা ও সদ্যবহার ইসলামের শিক্ষা

কোরআন মজিদের বিভিন্ন আয়াতে মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জাগতে পারে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে কোনরূপ সদাচারের অনুমতি দেয় না।

ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থেই এ সন্দেহের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। বিশেষত সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এ যুগে বিশ্ব মানব যখন একটি গ্লোবাল ফ্যামিলির রূপ ধারণ করেছে, যখন মনুষ্য সম্প্রদায় ও জাতিসমূহের আত্মনির্ভরতা অনস্বীকার্য পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন এ ধরনের সন্দেহ মুসলিম জাতির জন্য নিতান্ত অকল্যাণকর।

বস্তুত অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কি হবে, তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে কোরআন ও হাদিসে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আচরণ থেকে অমুসলিমদের সাথে সদ্যবহার ও সদাচারের এমন ঘটনাবলী পাওয়া যায় যা অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়ের ইতিহাসে একান্তই বিরল।

কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারে পূর্ণাঙ্গ তথ্য অনুসন্ধান করলে এ সম্পর্কিত ভ্রান্তির নিরসন হতে পারে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে ঠিকই।

আবার অনেক আয়াতে তাদের সাথে সদ্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ, সদ্যবহার ও সমবেদনা-এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করার পর কোন পর্যায়ে ইসলামের কি নির্দেশ রয়েছে তা ব্যক্ত হলেই অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের সীমা চিহ্নিত করা সহজ হবে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে কতিপয় স্তরে বিভক্ত করা যায়। যথা : বন্ধুত্ব ও ভালবাসা, সমবেদনা, সৌজন্য ও আতিথেয়তা, সমঝোতা এবং লেনদেনের স্তর। প্রত্যেকটি স্তরের জন্যে ইসলামের বিভিন্ন নির্দেশ ও নীতিমালা রয়েছে।

বন্ধুত্ব : অমুসলিম ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্ব বা ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে মানুষের আগমন হয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। অন্য প্রাণী, বৃক্ষ-লতা কিংবা জড়পদার্থের মত মানব জীবন ইহজগতসর্বস্ব নয়। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষকে এ জগতে পাঠানো হয়েছে, মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকলাপ তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে হবে। আল্লাহর

এবাদত তথা দাসত্ব ও আনুগত্য মানব জীবনের লক্ষ্য। অতএব, তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোন কাজ-কর্ম তার জন্যে অনুমোদিত নয়। অমুসলিম ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্বের ফলে মুমিনের এবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণে কোরআন মজিদের বিভিন্ন আয়াতে মুসলমানদেরকে অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার মত ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে সামাজিক পর্যায়ে অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের আন্তরিক সম্পর্ক অনেক কুফল বয়ে আনতে পারে। ঘনিষ্ঠতার সুবাদে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিষয় অবগত হয়ে তারা এমন পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ লাভ করবে যাতে মুসলমানদের সমূহ বিপদ ঘটতে পারে। তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে খুবই সতর্কতার প্রয়োজন হয়। আধুনিক সভ্যতায় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো পরস্পরে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ না করলেও এ সম্পর্কে কেউ-ই একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে দেয়া না। উদ্দেশ্য একটাই। তা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

সমবেদনা : সহানুভূতি প্রকাশ, হিত কামনা ও উপকার করার ক্ষেত্রে মুসলমান-অমুসলমানে কোন পার্থক্য নেই। যাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান এমন অমুসলিম ব্যতীত সবার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা যায়। অমুসলমানদের উপকার করার কোন বাধা তো নেই বরং ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম জনগণ এক্ষেত্রে মুসলমান নাগরিকের সমান হকদার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের জীবনে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ রেখে গিয়েছেন। জনৈক ইহুদি বালক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসা-যাওয়া করতো। একদিন তিনি ছেলেটিকে দেখতে না পেয়ে তার খোঁজ নিলেন। জানা গেল, ছেলেটি অসুস্থ। তিনি তৎক্ষণাত তার বাড়িতে গিয়ে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে ছেলেটি তার পিতামাতার সম্মতিক্রমে মুসলমান হয়ে যায়। অমুসলিম নাগরিকের সেবা করার এমন প্রচুর ঘটনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনে দেখা যায়। মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে সাহায্য প্রেরণ করেন। অথচ এরাই অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়ন করে মুসলমানদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল। ওমর রা. মুসলমানদের মত অমুসলিম দরিদ্রদেরকেও বায়তুল মাল থেকে সহযোগিতা প্রদান করতেন। কোরআন মজিদে মুসলমানদের প্রতি এরূপই নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেনি তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।’ (মুমতাহিনা-৮)

ন্যায়বিচার ও সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম, চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলিম এবং শত্রু অমুসলিম সবাই সমান। এমনকি জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করার জন্যে ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। তাদের পিঠে তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাতে নিষেধ করা হয়েছে।

সৌজন্য ও আতিথেয়তা : বাহ্যিক সদাচার ও সৌজন্যের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের কোনো শ্রেণিবিভেদ নেই। এমনকি যুদ্ধরত অমুসলিমরাও সৌজন্যমূলক ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। কাফেররা আত্মীয় হলেও তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা যাবে না এ নির্দেশ নাজিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম এই নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে বাস্তবায়িত করেন। ফলে দেখা গেল, ঘরে ঘরে পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। যদিও মানব প্রকৃতি ও সহজাত প্রবণতার জন্যে এরূপ করা সহজ ছিল না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে নিজেদের প্রবৃত্তি ও পারস্পরিক সম্পর্কের পরওয়া করতেন না। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি জানিয়ে দেন। বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা করতে নিষেধ নেই। বুখারি ও মুসনাদে আহমদ এ বর্ণিত আছে, আসমা রা.এর মাতা, আবু বকর সিদ্দিক রা.এর স্ত্রী কবিলা হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কাফের অবস্থায় মক্কা থেকে মদিনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্যে কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু আসমা রা. তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার মাতা আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের। আমি তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জননীর সাথে সদ্ব্যবহার করো।

মক্কা বিজিত হলে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদিনকার শত্রু তাঁর করতলগত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি তাদেরকে এই বলে মুক্ত করেছেন যে, তোমাদের ওপর আজ আমার কোন অভিযোগ নেই। অর্থাৎ তোমাদের অতীত অত্যাচারের কোন প্রতিশোধ তো নেবই না, এমনকি সেজন্যে ভরসনাও করছি না। বদর যুদ্ধে যেসব কাফির বন্দি হয়ে এসেছিল, তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করেছিলেন, যা অনেক পিতাও পুত্রের সাথে করেন না।

আতিথেয়তার ব্যাপারেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম মুসলিম-অমুসলিমের কোন বাছবিচার করতেন না। অমুসলিম ছাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে মসজিদে নববীতেই অবস্থান করতে দেন। অথচ মুসলমানদের দৃষ্টিতে মসজিদ হলো সবচেয়ে সম্মানিত স্থান।

সমঝোতা : ধর্মীয় উপকার সাধন কিংবা অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অমুসলমানদের সাথে সমঝোতায় উপনীত হওয়া বা শান্তিচুক্তি সম্পাদন করার কোন নিষেধ নেই। সূরা আলে ইমরানে ‘তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করো’ বলে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্ন অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। সমঝোতার মাধ্যমে যেমন বিপরীত পক্ষকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে, তেমনি একই সাথে বিপরীত পক্ষের কাছ থেকে নিজেদের পক্ষের স্বীকৃতি আদায় করা হয়। তাছাড়া সমঝোতা ও শান্তির সম্পর্কের কারণে পরস্পরে মেলামেশার যে সুযোগ হয় তাতে মুসলমানদের উন্নত চরিত্র ও অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অমুসলমানরা অবহিত হতে পারে। এতে তারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামের দিকে এগিয়ে আসবে। হৃদয়বিয়ার সন্ধিতে যেসব শর্ত ছিল, তা বাহ্যত মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হলেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মেনে নিয়েছিলেন। কোরআনেও এটিকে সুস্পষ্ট বিজয় নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, অল্পদিনেই অনেক কটুর কাফের মুসলমান হয়ে যান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক অমুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন। অমুসলিম গোত্র ও রাষ্ট্রের দূতদের সাথে তিনি সবসময় সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতেন।

লেন-দেন : ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরির ক্ষেত্রে অমুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েজ। যদি এর কারণে মুসলমানদের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে তা জায়েয থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা থেকে এটি প্রমাণিত হয়। ফকিহগণ একারণেই যুদ্ধমান অমুসলিমদের হাতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধু স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন। তাদেরকে চাকরি প্রদান এবং তাদের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা মুসলমানদের জন্যে অবৈধ নয়।

ইসলামে অমুসলিমদের জন্যে উদারতা ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা রয়েছে। তাদের সাথে যদিও বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু সহানুভূতি, সৌজন্য, আতিথেয়তা ও লেন-দেনমূলক আচরণ করতে নিষেধ করা হয়নি।

অমুসলিমদের সঙ্গে যেমন ছিল নবীজির আচরণ

ইসলাম এমন জীবনব্যবস্থা, যার বিশ্বসমাজ গড়ে তোলার সব উপাদান, মাধুর্য ও ঔদার্য আছে। নবীর আদর্শ থেকে আমরা এ অনুপম আদর্শের শিক্ষা পাই। আজ কথা বলবো আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সা. অমুসলিমদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন।

হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছিলো। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার দেখাদেখি আমরাও দাঁড়ালাম। আমরা তাকে বললাম, 'ইয়া রসুলুল্লাহ! এ তো এক ইহুদির লাশ! রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যখন কোনো লাশ নিতে দেখবে, তখন দাঁড়াবে।' (বুখারি ১৩১১)

আরেক হাদিসে এসেছে, হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ ও হযরত কায়েস ইবনে সাদ রা. একদিন বসা ছিলেন। তারা তখন কাদিসিয়ায় থাকেন। পাশ দিয়ে একটি লাশ নেয়া হচ্ছিল। তা দেখে তারা দুজনই দাঁড়ালেন। উপস্থিত লোকেরা তাদেরকে জানাল, 'এ এক অমুসলিমের লাশ।' তারা তখন শোনালেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়েও একবার এক লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তিনি যখন তা দেখে দাঁড়ালেন, উপস্থিত সাহাবায়ে কেলাম তখন বললেন, এ তো ইহুদির লাশ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أليست نفسا অর্থাৎ 'সে মানুষ ছিল তো?' (বুখারি ১৩১২) অমুসলিমদের সাথে আচরণে ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষা করার জন্যে ইসলাম যে উদার নির্দেশনা দেয়, উপরের হাদিসটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

অমুসলিমদের সঙ্গে ঠাণ্ডা ও কথাবার্তা বলা বৈধ। এমনকি প্রয়োজনে তারা মসজিদে বসারও অনুমতি আছে। যখন সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি রসুল সা.-এর দরবারে হাজির হয়েছে, তখন তারা মসজিদের শেষে গম্বুজের কাছে অবস্থান করে।

যখন নামাজের সময় হলো, দলের একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রসুল, নামাজের সময় হয়েছে। এরা একদল অমুসলিম, তারা মসজিদে আছে। তখন রসুল সা. বলেন, ‘অমুসলিমদের কারণে জমিন নাপাক হয় না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৮৫৭৬)

কোনো অমুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়লে রসুল্লাহ সা. তাকে দেখতে যেতেন। অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া সুন্নত। নবী করিম সা. অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন। তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন।

হযরত আনাস রা. বলেন, এক ইহুদি দাস নবী করিম সা.-এর খেদমত করত। যখন সে অসুস্থ হলো, তখন মহানবী সা. তাকে দেখতে গেলেন, তার মাথার দিকে বসলেন আর তাকে বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো! তখন সে তার পিতার দিকে দেখল। পিতা বলেন, তুমি আবুল কাসেমের অনুসরণ করো, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী সা. এই বলে বের হলেন, আল্লাহর শোকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।’ (বুখারি ১২৫৬)

কোনো অমুসলিম মৃত্যু বরণ করলে তাদের সম্পর্কে রসুল সা. বলেন, তাদের জীবিতের যেমন হক রয়েছে, তেমনি মৃতেরও হক রয়েছে। প্রয়োজনে তাদের দাফন বা সৎকারে সহযোগিতা করতে হবে। কেননা তারা শ্রেষ্ঠ মাখলুক তথা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণিত, সাহল ইবনে হুনাইফ ও কায়েস ইবনে সাদ কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন। তখন তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাজা নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তখন তারা দুজন দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদের বলা হলো, ইনি তো কাফির। তখন তারা বলেন-মহানবী সা.-এর পাশ দিয়ে একসময় এক জানাজা নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির জানাজা। তখন তিনি বলেন, এটা কি প্রাণী নয় (মানব নয়)?’

অমুসলিমদের সঙ্গে যেমন ছিল নবীজি

ইসলাম এমন জীবনব্যবস্থা, যার বিশ্বসমাজ গড়ে তোলার সব উপাদান, মাধুর্য ও ঔদার্য আছে। নবীর আদর্শ থেকে আমরা এ অনুপম আদর্শের শিক্ষা পাই। আজ কথা বলবো আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সা. অমুসলিমদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন।

হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছিলো। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার দেখাদেখি আমরাও দাঁড়ালাম। আমরা তাকে বললাম, ‘ইয়া রসুলুল্লাহ! এ তো এক ইহুদির লাশ! রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যখন কোনো লাশ নিতে দেখবে, তখন দাঁড়াবে।’ (বুখারি ১৩১১)

আরেক হাদিসে এসেছে, হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ ও হযরত কায়েস ইবনে সাদ রা. একদিন বসা ছিলেন। তারা তখন কাদিসিয়ায় থাকেন। পাশ দিয়ে একটি লাশ নেয়া হচ্ছিল। তা দেখে তারা দুজনই দাঁড়ালেন। উপস্থিত লোকেরা তাদেরকে জানাল, ‘এ এক অমুসলিমের লাশ।’ তারা তখন শোনালেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়েও একবার এক লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তিনি যখন তা দেখে দাঁড়ালেন, উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তখন বললেন, এ তো ইহুদির লাশ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, *أليست نفسا* অর্থাৎ ‘সে মানুষ ছিল তো?’ (বুখারি ১৩১২) অমুসলিমদের সাথে আচরণে ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষা করার জন্যে ইসলাম যে উদার নির্দেশনা দেয়, উপরের হাদিসটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

অমুসলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা ও কথাবার্তা বলা বৈধ। এমনকি প্রয়োজনে তারা মসজিদে বসারও অনুমতি আছে। যখন সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি রসুল সা.-এর দরবারে হাজির হয়েছে, তখন তারা মসজিদের শেষে গম্বুজের কাছে অবস্থান করে।

যখন নামাজের সময় হলো, দলের একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রসুল, নামাজের সময় হয়েছে। এরা একদল অমুসলিম, তারা মসজিদে আছে। তখন রসুল সা. বলেন, ‘অমুসলিমদের কারণে জমিন নাপাক হয় না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৮৫৭৬)

কোনো অমুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়লে রসুল্লাহ সা. তাকে দেখতে যেতেন। অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া সুন্নত। নবী করিম সা. অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন। তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন।

হযরত আনাস রা. বলেন, এক ইহুদি দাস নবী করিম সা.-এর খেদমত করত। যখন সে অসুস্থ হলো, তখন মহানবী সা. তাকে দেখতে গেলেন, তার মাথার দিকে বসলেন আর তাকে বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো! তখন সে তার পিতার দিকে দেখল। পিতা বলেন, তুমি আবুল কাসেমের অনুসরণ করো, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী সা. এই বলে বের হলেন, আল্লাহর শোকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।’ (বুখারি ১২৫৬)

কোনো অমুসলিম মৃত্যু বরণ করলে তাদের সম্পর্কে রসুল সা. বলেন, তাদের জীবিতের যেমন হক রয়েছে, তেমনি মৃতেরও হক রয়েছে। প্রয়োজনে তাদের দাফন বা সৎকারে সহযোগিতা করতে হবে। কেননা তারা শ্রেষ্ঠ মাখলুক তথা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণিত, সাহল ইবনে হুনাইফ ও কায়েস ইবনে সাদ কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন। তখন তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাজা নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তখন তারা দুজন দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদের বলা হলো, ইনি তো কাফির। তখন তারা বলেন-মহানবী সা.-এর পাশ দিয়ে একসময় এক জানাজা নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির জানাজা। তখন তিনি বলেন, এটা কি প্রাণী নয় (মানব নয়)?’ (সহিহ বুখারি ১২১৩)

অমুসলিমদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষেধ। যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে জিম্মি হিসেবে (মুসলিম রাষ্ট্রের আইন মেনে) বসবাস করে, তাদের হত্যা করা যাবে না। তেমনি যারা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের হত্যা করা যাবে না। তাদের জানমালের নিরাপত্তা মুসলমানদের মতোই অপরিহার্য। হাদিস শরিফে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধি ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়। (বুখারি ৩১৬৬)

সদকা শব্দটি সাধারণত নফল দান-অনুদান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থে যেকোনো অমুসলিমকে দান করা সব আলেমের ঐক্যমত্যে বৈধ। অমুসলিম প্রতিবেশী আক্রান্ত হলে, তারা বিপদগ্রস্ত হলে মুসলমানদের উচিত তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

হযরত উমর রা. বৃদ্ধ ইহুদির জন্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন- এটা তো তিনি শাসক হিসেবে করতেই পারেন। কিন্তু তিনি সেই ইহুদিকে লক্ষ করে যে কথাটি বললেন, তা আমাদের সামনে চিন্তার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে। যে সহানুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন এটাই ইসলামের সৌন্দর্য ও আসল চরিত্র।

তবে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি জাকাত অমুসলিমদের দেওয়া যাবে না। শুধু জাকাতের ক্ষেত্রে বিধানের স্বাভাবিক ধরে রাখা হয়েছে, অন্যথায় যেকোনো দান-সদকা, এমনকি ফিতরাও অমুসলিমদের দেওয়া যায়।

এখানে লক্ষণীয় যে জাকাত দিতে হয় বছরে একবার। মুসলিম ধনীদের মধ্যে কারো প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা কিংবা এর অর্থমূল্য পরিমাণ সম্পদ মজুদ থাকলে এবং এর ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়। এটি ধনীদের সম্পদ থেকে ২.৫ শতাংশ আদায় করতে হয়। অন্যদিকে সদকা বছরের যেকোনো সময় অনির্দিষ্ট পরিমাণ মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে দেওয়া যায়। তা ছাড়া সদকা ধনীরা ছাড়াও মোটামুটি সচ্ছল যে কেউ আদায় করতে পারে।

সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির, নানা পেশার, নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। যদি কারো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হলো—তার সঙ্গেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা করে চলতে হবে।

সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর ঘটনা। একদিন তার ঘরে একটি বকরি জবাই করা হল। খাবার রান্না হলে তিনি তার গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে কি এ খাবার দিয়েছ?’ এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রতিবেশীর বিষয়ে জিবরাইল আমাকে এত উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমি মনে করছিলাম, তিনি হয়ত তাদেরকে ওয়ারিশই বানিয়ে দেবেন। (তিরমিজি ১৯৪৩)

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, তোমার পিতা-মাতা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান (দলিল ও প্রমাণ) নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে সদাচরণ করো। আর এমন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করো, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের সে বিষয়ে অবহিত করব, যা তোমরা করতে। (সূরা লোকমান ১৫)

অমুসলিমদের দেয়া ইফতার খেলে রোজা হবে কি?

মুসলিমদের একটি বড় ইবাদত হলো পবিত্র মাহে রমজান। ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে সেহরির মাধ্যমে রোজা রাখার নিয়ত করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। রোজা রাখার পর নিয়ম মেনে করবেন ইফতার। কিন্তু আপনি কি জানেন, ইসলামী বিধিবিধান অনুযায়ী, রোজা শেষে কোনো অমুসলিমের কাছ থেকে নেয়া ইফতার খাওয়া যাবে কি-না?

রমজান মাস কোরআন নাজিলের মাস। কোরআন মানুষের জন্য হেদায়েত বা পথনির্দেশক। মুসলিম উম্মাহর জন্য নির্দেশনা হলো-যারা এ মাসটি পাবে তাদের জন্য রোজা পালন করতে হবে। তাই এই মাস সব মুসলমানের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস।

এই মাসে রোজা রেখে ইফতার করার সময় অনেকে প্রতিবেশী অমুসলিম বিশেষ করে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দাওয়াত দেন। তাদের সঙ্গে নিয়েই শুরু করেন ইফতার। অনেক সময় তাদের দেয়া খাবার দিয়েও ইফতার করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা।

এতে রোজা হবে কি, হবে না এমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভোগেন অনেকেই। এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে মুসলিমদের পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছেন ধর্ম চিন্তাবিদরা।

ইসলামি বিধিবিধান অনুযায়ী হিন্দু কিংবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে ইফতার করাতে যেমন বাধা নেই। তেমনি তাদের দেয়া খাবার দিয়ে রোজা শেষে ইফতার করাতেও কোনো বাধা নেই ইসলামের বিধিবিধানে।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট আলেম ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ বলেছেন, রোজা রাখার পর ইফতার শেয়ার করা সওয়াব। তাই মুসলিমরা যেমন অন্য ধর্মের মানুষদের ইফতার দিতে পারে, তেমনি তাদের দেয়া খাবার দিয়ে ইফতার করতেও পারেন।

কারণ অন্য ধর্মের মানুষ ইসলাম ধর্মের রেওয়াজ বা অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছে, কোনো কিছু সাদরে গ্রহণ করছে এতে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য বাড়ে। সেইসঙ্গে বাড়বে ভালোবাসাও। তবে অন্য ধর্মের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া খাবার ইফতার হিসেবে গ্রহণের জন্য মেনে চলতে হবে একটি বিধান।

এ বিধান বিষয়ে ড. মানজুরে ইলাহী বলেন, ইফতার মূলত পানাহার বিরতি শেষ করার একটি প্রক্রিয়া। এটা কোনো সুনির্দিষ্ট ইবাদত নয়। যার কারণে অমুসলিমদের সঙ্গে নিয়ে ইফতার করলে তা দোষের হবে না। আবার তাদের দেয়া খাবার দিয়েও ইফতার করা যাবে। এতে রোজারও কোনো ক্ষতি হবে না।

কোনো অমুসলিম কোনো মুসলিমকে ইফতার পাঠানোর বিষয়ে ইসলাম ধর্মে বিধান রয়েছে। এ সম্পর্কে ড. মানজুরে ইলাহী বলেন, অমুসলিমদের দেয়া সব খাবারই ইফতার হিসেবে খাওয়া যাবে। তবে কোনো প্রাণীর গোশতের খাবার হলে সে গোশত খাওয়া যদি ইসলাম ধর্মে খাওয়া নিষিদ্ধ থাকে, তবে সেই মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কোনো অমুসলিম যদি ইফতার করার জন্য কোনো মুসলিমকে ইসলামি শরিয়াহ মতে হালাল মাংস এবং ইসলামে খাওয়া জায়েজ আছে এমন মাংস খেতে দেন তবে সে খাবার দিয়েও ইফতার করাতে কোনো বাধা নেই ইসলাম ধর্মে।

ইফতার দেয়া-নেয়ার এ রীতি রোজা, রমজান আর ইফতারের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তোলে। এতে অমুসলিমরা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই পারস্পরিক সম্প্রীতি আর ভালোবাসা বাড়াতে হিন্দু কিংবা অমুসলিম ভাইবোনদের নিয়ে ইফতার করার পাশাপাশি তাদের দেয়া খাবার দিয়েও ইফতার করতে পারেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা।

অমুসলিম দেশে মুসলিম স্থাপনা

মসজিদ মুসলমানদের নামাজ পড়ার জন্য নির্মিত স্থাপনা। মসজিদ মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যাবলির প্রাণকেন্দ্র। এখানে ইবাদত-বন্দেগি ছাড়াও শিক্ষা প্রদান, বিভিন্ন তথ্য বিতরণ এবং সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। তাই তো বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে ছোট-বড় একাধিক মসজিদের দেখা মেলে।

অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার

ইসলামের বিধান

এপর্যায়ে আমরা আলোচনা করবো অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার শরয়ী বিধান কি? ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া, না সুন্নাত। নিচের আলোচনা থেকে আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ফরজে আইন

অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ ঐ সময় ফরজ হবে যখন কুফর বিজয়ী থাকবে, সত্য পরাজিত থাকবে, দাঈর সংখ্যা হবে নিতান্তই কম, মন্দকাজ হবে ব্যাপক, মুখুর্খতা ও অজ্ঞতা সর্বস্তরে বিরাজ করবে। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে সাধ্যানুযায়ী অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত ফরজে আইন।

সুন্নাত

অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ ঐ সময় সুন্নাত হবে, যখন দাঈদের সংখ্যা থাকবে পর্যাপ্ত। দাওয়াতী সংঘঠন চতুরদিকে ছড়িয়ে পরবে। হক বিজয়ী থাকবে। বাতিল থাকবে পরাজিত। রাষ্ট্র নিজেই দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিবে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের উপর দাওয়াতী কাজ করা সুন্নাত।

ফরজে কেফায়া

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, অমুসলিম ভাই-বোনদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ফরজে কেফায়া। অনেকে বলেছেন সাধ্যানুযায়ী ফরজে আইন। আমরা ফরজে কেফায়াই ধরে নিলাম। এবার আমাদের জানতে হবে ফরজে কেফায়া কাকে বলে?

ফরজে কেফায়া বলা হয় এমন হুকুম বা কাজ, যা সকল মুসলমানের উপর ফরজ। তবে সকলের পক্ষ থেকে যদি কিছু মানুষ ওই কাজ আদায় করে দেয়, তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। যদি আদায় না করো তাহলে সকলেই গুনাহ।

সাধারণত ফরজে কেফায়া বলতে আমরা জানাজার নামাযকে বুঝি। কাফন দাফনসহ জানাজার নামায সম্পূর্ণ করতে হলে কমপক্ষে চারজন লোকের প্রয়োজন। একজন ইমাম হলে, বাকি তিনজন মুজাদি। দাফনের জন্য কবরের উপরে থাকবে দু'জন। আর লাশটি কবরে নামানোর জন্য কবরে থাকবে দু'জন। মোট কথা, কাফন-দাফন সম্পন্ন হতে হলে মোট চারজন লোকের প্রয়োজন। তাহলে ফরজে কেফায়া আদায় হবে। যদি ফরযে কেফায়া আদায় না হয়, তাহলে ওই মহল্লার সকলেই গুনাহগার হবে এবং সমাপ্ত করার দায়িত্ব পড়বে পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের উপর। যদি তারাও আদায় না করে, তাহলে পর্যায়ক্রমে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে। তদ্রূপ অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হলো ফরজে কেফায়া। প্রত্যেক অমুসলিমের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এমন কিছু লোক থাকতে হবে। যাদের মাধ্যমে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে যায়। যদি সকলের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে, তাহলে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে।

জানাজার নামাযের সাথে মিলালে বোঝা যায়, প্রত্যেক এলাকায় কমপক্ষে চার জন ব্যক্তি এমন থাকতে হবে, যারা সর্বদা অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদিও চারজন দ্বারা দাওয়াতের ফরজে কেফায়া আদায় হবে না।

প্রিয় পাঠক! এবার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি বলুন তো দেখি! আপনার এলাকায় (আপনি যে অঞ্চলেরই হোন না কেন।) এমন চারজন ব্যক্তি আছে, যারা সর্বদা অমুসলিমদের দাওয়াত দিচ্ছেন? যদি এলাকায় না থাকে তাহলে আপনার পুরো জেলায় এমন চারজন মানুষ আছে কি, যারা সর্বদা সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন? যদি উত্তর 'না' হয়, তাহলে বলুন, আমরা কি ফরজে কেফায়া আদায় করছি? যদি আদায় না করে থাকি তাহলে আমরা কি গুনাহগার হচ্ছি না? অবশ্যই হচ্ছি। আর কতদিন এই ফরজে কেফায়া ছেড়ে দেয়ার গুনাহ মাথায় নিয়ে ঘুরবো? যদি কোন ব্যক্তি এককভাবে দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি নিজে গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সকলেই গুনাহগার হবে।

জিম্মাদারী আদায়ের পদ্ধতি

দাওয়াতী কাজ যেহেতু আমাদের উপর ফরজ। এই কাজ আমাদের করতেই হবে। এখন প্রশ্ন হলো – কীভাবে করবো ? সবাই কি একসাথে দাওয়াত দিবে? সাধ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী একেক জনের কাজের ধরণও ভিন্ন হবে। বিষয়টি বুঝার সুবিধার্থে কুরআন থেকে তিনটি উদাহরণ পেশ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নামলের মাঝে দুইটি প্রাণীর আলোচনা করেছেন।

পিপীলিকা:

সুলাইমান – এর ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, সুলাইমান যখন সৈন্যদের নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথে এক স্থানে পিপীলিকার দল গর্ত থেকে বাইরে বের হয়ে এসেছিল। পিপীলিকার রাণী যখন বুঝতে পারলো যে তারা সুলাইমান আ. এর সৈন্য দলের পায়ের নিচে পরে পিষ্ট হয়ে যাবে। তখন রাণী পিপীলিকার দলকে ডাক দিয়ে বললো তোমরা তোমাদের গর্তে প্রবেশ কর। অন্যথায় তোমরা সুলাইমান আ. এর সৈন্যের পদদলিত হয়ে পিষ্ট হয়ে যাবে।

কুরআনে করীম পিপীলিকাদের রাণীকে দা'ঈ হিসাবে পেশ করেছে। কতো ছোট একটি প্রাণী! তার অন্তরে ছোট একটি ব্যথিত হৃদয়! তার মধ্যে নিজ জাতিকে বিপদ থেকে বাঁচানোর কতো ফিকির। সে কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি নিজ জাতিকে বিপদ থেকে বাঁচানোর ফিকির করেছে। কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের জাতি ঝাপ দিচ্ছে চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে। প্রতি মুহর্তে পা ফেলছে ধ্বংসের দিকে। এব্যাপারে আমাদের কোন ফিকির নেই।

হুদহুদ পাখি:

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নামলে হুদহুদ পাখির ঘটনা আলোচনা করেছেন। হুদহুদ পাখি মূলকে সাবায় গেল। গিয়ে দেখল ওই দেশের রাণী বিলকিস এবং তার পুরো জাতি আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে সূর্যের পূজা করছে। পাখি অস্থির হয়ে গেল। সে সরাসরি ওখানে লোকদের বুঝাতে পারলো না। কারণ তার ভাষা ভিন্ন, আর ওই দেশের ভাষাই ভিন্ন। পাখির ভাষা তারা বুঝতে পারতো না। সুলাইমান আ. পাখিদের ভাষা জানতেন। তাদের কথা বুঝতেন। তাই পাখি সুলাইমান আ. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশী দেশের খবর দিলো। বলল সেখানে শিরক হচ্ছে। ফলে আপনি দ্রুত কোন পদক্ষেপ নিন। সুলাইমান আ. হুদহুদের কথা শুনে খবরটি যাচাই-বাছাই করলেন। এরপর রাণী বিলকিসের কাছে দাওয়াতী পত্র পাঠালেন। এর ফলে রাণী বিলকিস ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

একটি সাধারণ পাখির প্রচেষ্টায় একটি দেশের রাণী ইসলাম কবুল করেছে। এর দ্বারা আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি, আমরা যদি নিজে কোন কারণে দাওয়াতী কাজ না করতে পারি, তাহলে এমন লোককে এই কাজে নিয়োগদেব, যে এই কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে। আমরা যদি মাদ'উর ভাষা না বুঝি তাহলে মাদ'উর ভাষায় ইসলামী পুস্তিকা বই এবং কুরআন ইত্যাদি প্রকাশ করে বিতরণ করতে পারি।

আমাদের দেশে খ্রিস্টানরা বিভিন্ন বই পুস্তক বিতরণ করে। যেখানে সেখানে ইঞ্জিল বিতরণ করে। এসকেটি নামে ডাক যোগে বই ও প্রচারপত্র বিতরণ করে। এই কাজের জন্য তারা নির্দিষ্ট লোক নিয়োগ দিয়েছে। তারা এর জন্য চেষ্টা মেহনত চালিয়ে যাচ্ছে। এতে সফলতাও অর্জন করছে। যা আমাদের করার ছিল তা আমরা করছি না।

প্রিয় পাঠক! বলুন তো এপর্যন্ত কয়জন অমুসলিমের কাছে কয়টি বই বা কুরআন বিতরণ করেছেন? নিজেরা সরাসরি দাওয়াত না দিতে পারলে কমপক্ষে বই পুস্তক বা পত্রের মাধ্যমে খুব সহজেই দাওয়াত দিতে পারি।

আসহাবে কাহাফের কুকুর:

সূরা কাহাফে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফের কুকুরের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। সেই সাত যুবক যুগের বাদশার সামনে হকের আওয়াজ উচু করে ছিল। ফলে পুরো রাষ্ট্র তাদের দুশমন হয়ে যায়। তারা তাদের জাতি থেকে দূরে এক স্থানে এসে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। তাদের সাথে ছিল একটি কুকুর, যা তাদের পাহারা দিচ্ছিলো।

এর দ্বারা বুঝাগেল যে, কেউ যদি নিজে দাওয়াতী কাজ না করতে পারে অন্যকে দিয়েও করতে পারছে না তাহলে কমপক্ষে দাঈ ইলাল্লাহ সহযোগী ও পাহারাদারী হিসাবে কাজ করবে। দাঈদের প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা করবে।

দাওয়াত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে দলিল হিসাবে যে সকল আয়াত পেশ করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি নিচে পেশ করা হলো-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্ প্রতি ঈমান আনবে।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
বলে দিন এটাই আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ পবিত্র, আমি অংশীবাদীদের (শিরককারীদের) অন্তর্ভুক্ত নই।

এই আয়াতে সকল উম্মতের উপর দাওয়াতের জিদ্দাদারী দেয়া হয়েছে। ইমাম গাজালী রহ. একস্থানে লিখেছেন, যদি কোন এলাকায় কোন কাফের মারা যান, তাহলে সকল মুসলিম জিজ্ঞাসিত হবে।

وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ না করে। সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের দলভুক্ত হবেন না।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তাওফিক দান করুন।

গ্রন্থসহায়িকা

১। ইসলাম ও রাজনীতি

জাস্টিস মুফতি মুহাম্মাদ তকী উসমানী

২। অমুসলিম দেশে মুসলমান

মুফতি আখতার ইমাম আদিল কাসিমি

৩। অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক

জাস্টিস মুফতি মুহাম্মাদ তকী উসমানী

৪। সিরাত থেকে শিক্ষা

ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ:

৫। দাওয়াহ ডেস্ক

ইন্টারনেট সোর্স